রাজার চরিত্র বিচার — 'রাজা' নাটকের 'রাজা' চরিত্রেই রবীন্দ্রনাথ সর্ব প্রথম ঐশ্বরিক শক্তি আরোপ করেছেন। 'রাজা' নাটকের 'রাজা' চরিত্রে রবীন্দ্রনাথ ঈশ্বর বা পরমাত্মা বা অরূপের একটি সম্পূর্ন রূপ উদ্‌ঘাটনের প্রয়াস করেছেন। জগতের বিচিত্র বাস্তব কর্ম ও চিন্তা, বৈষ্ণব প্রেম তত্ত্ব ও দর্শনের শিলা সম্মত এক মিশ্রণের মাধ্যমে রাজা নাটকে কবির ঈশ্বরানুভূতির প্রকাশ ঘটেছে।

'রাজা' নাটকের 'রাজা' সেই পরমাত্মারই প্রতীক। তিনি কোন নির্দিষ্ট রূপে আবদ্ধ নন, বহু রূপে প্রকাশিত, সেইহেতু রাজার প্রজারা বা লোক রাজাকে চাক্ষুস দেখেনি। (ডাকঘর' নাটকে রাজার অস্তিত্ব থাকা সত্ত্বেও তিনি সেখানে সম্পূর্ন অনুপস্থিত আর রক্তকরবীতে তিনি জালের আড়ালে বাস করেন) যারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে রাজা কে দেখতে চায়, তাদের সংশয় যে রাজা আদৌ নেই। এ নাটকের মধ্যে রাজা কোথাও প্রত্যক্ষ ভাবে অংশ গ্রহণ করেন নি। অথচ তিনি সর্বত্র ব্যাপ্ত। ঈশ্বর যেমন লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে জগতের সব কিছুই নিয়ন্ত্রন করছেন তেমনি রাজা নাটকের রাজাও অদৃশ্য থেকে সমস্ত ঘটনা নিয়ন্ত্রন করছেন। রাণী সুদর্শনাও তাঁকে প্রথম অবস্থায় দেখতে পায়নি। হৃদয়ের জগতে অর্থাৎ অন্ধকার কক্ষেই একমাত্র তাঁর সাথে রাণীর মিলন ঘটেছে। সুদর্শনা মানবাত্মার প্রতীক, তাই তার সাথে রাজার সম্পর্ক বধূর সম্পর্ক। এই বিশিষ্ট আগাতিক সম্পর্কের সূত্রটিকে অবলম্বন করে উপলব্ধির আদর্শ চরম পর্যায়কে লেখক উপস্থিত করতে চেয়েছেন।

প্রকৃতিতে ও মানব জীবনের নব নব রূপে ও রসে যার অনির্বচনীয় আস্বাদন করা যায় তাঁকে ইন্দ্রিয়ানুভূতির গম্য প্রত্যক্ষতার জন্য অস্থির হলে বিভ্রান্তি অবশ্যম্ভাবী। রুদ্র ও শান্ত সুন্দর প্রাকৃতিক দ্বৈত রূপেই লীলাময়ের রূপ প্রকাশ পায়। তিনি কেবল মনোহর ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সুন্দর নন, তিনি ভয়ঙ্কর সুন্দর। সুরঙ্গমার বর্ণনায় — "যত ভয়ানক ততই সুন্দর" পার্থিব বুদ্ধি দিয়ে এই দ্বৈত রূপকে জানা যায় না, আস্বাদন করতে হয় অন্তরের উপলব্ধি দিয়ে। এই রাজা বা ঈশ্বরকে যে যেভাবে সাধনা করে সে সেভাবেই পায়। তার কাছে সব রাস্তাই রাস্তা। সুদর্শনা অন্তরের পৌঁছিবার জন্য কোন বিশেষ পথ নেই। সব রাস্তাই রাস্তা। সুদর্শনা অন্তরের নিভৃত কক্ষে এই দ্বৈত রূপে পরমাত্মাকে দেখতে পায়নি। তাই সে তাঁকে প্রত্যক্ষ আলোকে সুন্দর রূপে দেখতে চেয়ে ভুল করে বসেছিল। অনুভবে গম্য অরূপ লৌকিক দৃষ্টির অনধিগম্য রাজা বলেন, "মূঢ় যারা তারা বলেই এই অরূপ লৌকিক দৃষ্টির অনধিগম্য রাজা বলেন, "মূঢ় যারা তারা মনে করে দেখতে পাচ্ছি।" যারা বাইরের আলোয় পরমাত্মা বা অরূপকে খুঁজতে যায় তারা জানে না যে জীবাত্মা বা মানবাত্মার মধ্যেই আনন্দ রস রূপে তার স্থিতি। তিনি অরূপ রতন। যে একটি রূপের মধ্য দিয়ে তাঁকে দেখতে চায়, সে তাকে কখনো দেখতে পায় না। সুরঙ্গমা রাজাকে সম্পূর্ণভাবে লাভ করেছে। দুঃখের মধ্যে দুঃখানলে দগ্ধ হয়ে দাসীরূপে সুরঙ্গমা ভগবানকে পেয়েছে।

ইন্দ্রিয়াতীত প্রজ্ঞালোকে অরূপের সাক্ষাৎ সে নিয়ত পায় আর ইন্দ্রিয় মন সমস্তই সেই তন্ময়তায় নিমজ্জিত হয়। ভাবানুভূতির মধ্যেই তার সত্যোপলব্ধির স্পর্শ লাভ ঘটে। সুরঙ্গমা বলে, "আমার একটা বোধ জন্মে গেছে, আমার বোঝবার জন্য কিছুই দেখবার দরকার হয় না।"

দাসী সুরঙ্গমা ছাড়া ঠাকুরদা ভগবান কে লাভ করেছে। ঠাকুরদা তাঁকে পেয়েছেন সখ্য ভাবের সাধনায়। ইন্দ্রিয়মাত্র সুখকর বিষয়ানন্দ ত্যাগ করে নিষ্কাম আনন্দে অধিষ্ঠিত হয়েই ঠাকুরদা রাজার প্রতিনিধিত্বের যোগ্যতা লাভ করেছেন। ঠাকুরদা বলেন রাজার সেবায় পুরস্কারের প্রত্যাশা তার নেই, কারণ — "বন্ধুকে কি কেউ কোনদিন পুরস্কার দেয়।" ঠাকুরদাও সুরঙ্গমার মত ভগবানের দ্বৈত লীলার অন্তর্নিহিত ঐক্য উপলব্ধি করেছেন। তাই তিনি বলতে পারেন — "সুখে দুঃখে তাকে চিনে নিয়েছি এখন আর সে কাঁদাতে পারে না।" ঠাকুরদা প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে লীলাময় অরূপের লীলা সহচর হয়ে জীবন কে উপলব্ধি করে নিবিড়ভাবে অরূপের সান্নিধ্য লাভে সক্ষম হয়েছেন।

'রাজা' নাটকের রানী সুদর্শনার ক্ষেত্রে তখনই অন্ধকার কক্ষে অন্তরঙ্গ রাজার সাক্ষাৎ সম্ভব হল যখন সমস্ত স্বার্থ ও অভিমান দগ্ধ হয়ে অপরিসীম দুঃখ ভোগের পর সে পথে বেরিয়ে পড়তে পেরেছে।

রবীন্দ্রনাথ রাজা বা অরূপ ভগবান সম্পর্কে লৌকিক ধারণার দিকগুলোকে পরিস্ফুট করার জন্য ঠাকুরদার সাথে পথিক ও নাগরিকদের আলাপকে মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করেছেন।

কিন্তু কবির উপলব্ধ রাজাকে ব্যক্তিগত মঙ্গল-অমঙ্গলের ধারণার দ্বারা জানা যায় না। স্থূল বাসনার পরিপূর্তি সাধনের জন্য সৃষ্টি নয় ~~তিনি~~ তাঁর সমস্ত সৃষ্টির মূলে আনন্দ রস রূপে উপস্থিত। এই নাটকের কাঞ্চীরাজ প্রবল নাস্তিকতা ও শক্তিমত্তার পথ ধরে চলবার প্রয়াস করেছিল। শেষপর্যন্ত কঠিন দুঃখের মধ্যে অবশেষে প্রমাণ পেল যে রাজা বা ঈশ্বর আছেন। তাই সর্বস্বার্থ ত্যাগ করে আধ্যাত্মিক সাধনার পথে বেরিয়ে পড়তে তাকে আর দ্বিধাগ্রস্ত হতে হয়নি।

একদিকে রাজা চরিত্রের মধ্যে যেমন ক্ষমার প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়, প্রয়োজনে তেমন আবার নিষ্ঠুরও হতে পারেন। রাজা চরিত্রের এইখানেই বৈপরীত্য। এইজন্য তাঁর ধ্বজায় পদ্ম ফুলের মাঝখানে বজ্র আঁকা। তিনি সুদর্শনার প্রতি যেমন করুণা প্রকাশ করেছেন তেমনি সে যখন মোহান্ধ হয়ে ভুল পথে চলেছে তখন তাকে নিষ্ঠুর আঘাতও করেছেন। সুদর্শনার রাজরাণীর অহংকার ঘুচিয়েই তিনি তাকে পরিত্রাণ দেননি এবং তাকে পথের ভিখারিণী করে ছেড়েছেন। সুদর্শনাকে তাই শেষে বলতে হয়েছে, "তার পণটাই রইল, পথে বের করলে তবে ছাড়লে।" যথার্থ ঐশ্বরিক শক্তি বলতে রবীন্দ্রনাথ এই বুঝেছেন। ঈশ্বরের প্রেম এবং করুণার যেমন অন্ত নেই তেমনি তাঁর শক্তিরও তুলনা নেই।

এইভাবেই বিভিন্ন চরিত্র ও ঘটনার সহযোগে নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ 'রাজা' নাটকে রাজার তত্ত্ব বা স্বরূপটিকে বিশ্লেষণ করেছেন।

———— x ————